হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাত স্যার

সমাস

■ সমাস কোন ভাষার শব্দ?
=> তৎসম বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ।
■ সমাস কি ধরনের বা কি জাতিয় শব্দ?
=> পারিভাষিক শব্দ।
■ সমাসের কাজ কি?
=> শব্দগঠন এবং এটি শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।
■ → সমাস প্রত্যয় সাধিত (কৃৎ প্রত্যয়) শব্দ (সম্+√অস্ + অ)।
■ সমাস অর্থ কি?
=> সংক্ষেপন বা মিলন (একাধিক পদের সংক্ষেপন বা মিলন)।
■ সমাসের বিপরীতার্থ কি?
=> বিচ্ছেদ বা বিগ্রহ।
■ সমাসের রীতি কোথা থেকে এসেছে?
=> সংস্কৃত ভাষা থেকে।
■ সমাসের উদ্দেশ্য কি?
=> বাক্যের পদের সংক্ষেপন করা।
■ শব্দ গঠনের প্রধান উপায় কয়টি?
=> ৩টি → (i) উপসর্গ
(ii) প্রত্যয়
(iii) সমাস *

[অপ্রধান উপায় → সন্ধি
বিভক্তি
পদ পরিবর্তন ইত্যাদি]

উদাহরণঃ পুষ্পাঞ্জলী কোন উপায়ে গঠিত হয়েছে?
(i) সন্ধি (ii) সমাস (iii) প্রত্যয়
[যেহেতু প্রত্যয় প্রধান উপায়ে গঠিত শব্দ সমাসের আগে তাই প্রত্যয় হবে উত্তর]

* মৌ সংগ্রহ করে যে মাছি = মৌমাছি
পরপদ/উত্তরপদ/অন্তপদ/শেষপদ

এখানে,
মৌ = পূর্ব পদ (১মে আছে)
মৌ সংগ্রহ করে যে মাছি → প্রত্যেকটা সমাস বাক্যের পদ তাই এরা সমস্যমান পদ।
অনুরূপভাবে,
মৌ মাছি → সমস্যমান পদ।
সংগ্রহ করে যে → মধ্যপদ
মৌ সংগ্রহ করে যে মাছি = পুরাটার মূল নাম সমাসবাক্য। অপরনাম ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য
মৌমাছি → সমস্তপদ / সমাসনিষ্পন্ন পদ
পূর্বপদ পরপদ

সমাসের প্রকারভেদ

সমাস প্রধানত ৬ প্রকার।

1. দ্বন্দ্ব সমাস
2. তৎপুরুষ সমাস
3. কর্মধারয় সমাস
4. দ্বিগু সমাস
5. অব্যয়ীভাব সমাস
6. বহুব্রীহি সমাস

(২, ৩, ৪ — পরপদের অর্থ প্রধান)

মূলত 4 প্রকার।

→ দ্বন্দ্ব
→ তৎপুরুষ
→ অব্যয়ীভাব
→ বহুব্রীহি

> * রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদান কারক এবং দ্বিগু সমাসকে অস্বীকার করেছেন।

কোন সমাসের কোন পদ প্রধান

পূর্বে [অব্যয়] পরে [দ্বিতক]
উভয়ের [দ্বন্দ্ব] নতুন [বহুতে]

দ্বি = দ্বিগু
ত = তৎপুরুষ
ক = কর্মধারয়
অব্যয় = অব্যয়ীভাব
বহুতে = বহুব্রীহি

* অব্যয়ীভাব → পূর্বপদ প্রধান
* দ্বিগু, তৎপুরুষ, কর্মধারয় → পরপদ প্রধান
* দ্বন্দ্ব → উভয়পদ প্রধান
* বহুব্রীহি → নতুন বা অন্যপদের অর্থ প্রধান

- অব্যয়ীভাবের বিপরীত → দ্বিতক
  দ্বিতক এর " → অব্যয়ীভাব
- দ্বন্দ্বের বিপরীত → বহুব্রীহি
  বহুব্রীহির " → দ্বন্দ্ব

* নিত্য ও প্রাদি সমাসেও পূর্বপদ প্রধান

সংক্ষেপে সমাস চেনার উপায়

- বাপ-মা = দ্বন্দ্ব সমাস (যেহেতু এখানে দুইটা পদই প্রধান তাই দ্বন্দ্ব)
- বাপের মা / দাদী = বহুব্রীহি (পূর্বপদ, পরপদ কোনটা না বুঝিয়ে যেহেতু ভিন্ন অর্থ দিয়েছে তাই বহুব্রীহি)
- দশানন (রাবণ) = বহুব্রীহি [দশানন (১০ মাথা) → দশানন বলতে আসলে রাবণকে বোঝায়, এখানেও যেহেতু নতুন অর্থ বোঝায় তাই বহুব্রীহি]
- চৌরাস্তা = দ্বিগু (পূর্বপদে সংখ্যা এবং পরপদের অর্থ প্রধান হলে দ্বিগু)
- সপ্তাহ = দ্বিগু (")
- পঞ্চনদী = দ্বিগু (")
- আমিষ → পুষ্টি আছে যার এমনটা
  নিরামিষ → আমিষ নেই এমনটা → অব্যয়ীভাব সমাস
  নির → উপসর্গ / অব্যয়সূচক পদ
  [পূর্বে অব্যয় এবং তারই অর্থ প্রধান হলে অব্যয়ীভাব সমাস]

* যে পদগুলো পরিবর্তন করা যায় না, সেগুলো অব্যয়সূচক পদ।

- আমরণ → অব্যয়ীভাব সমাস
- সোনার বাংলা → তৎপুরুষ [পূর্বপদে বিভক্তি পরপদ প্রধান হলে তৎপুরুষ সমাস]
  র → বিভক্তি
- সিংহাসন (হাসন প্রধান) → কর্মধারয় [পরপদের অর্থ প্রধান হলে কর্মধারয়]

- দুটি পদের অর্থ প্রধান হলে → **দ্বন্দ্ব সমাস**
- দুটি পদের অর্থ প্রধান না হয়ে অন্যকিছু বোঝালে → **বহুব্রীহি**
- পূর্বে উপসর্গ এবং তারই অর্থ প্রধান থাকবে এবং সে মূল শব্দকে পরিবর্তন করে দিবে → **অব্যয়ীভাব**
- পূর্বে সংখ্যা এবং পরপদের অর্থ প্রধান → **দ্বিগু**
- পূর্বপদের সাথে বিভক্তি পরপদ প্রধান → **তৎপুরুষ সমাস**
- পূর্বে বিভক্তি / সংখ্যা নাই, পরপদের অর্থ প্রধান → **কর্মধারয়**

কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে পরপদের অর্থই প্রধান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

[পূর্বপদ N (বিশেষ্য) + পরপদ N (বিশেষ্য)
N (বিশেষ্য) + Adj (বিশেষণ)
Adj (বিশেষণ) + N (বিশেষ্য)] এবং পরপদের অর্থ প্রধান

⇒ নীলপদ্ম (নীল – A, পদ্ম – N)

⇒ আলুসিদ্ধ → সিদ্ধ যে আলু

——— ০ ———

কর্মধারয় সমাস চার প্রকার।

① রূপক
② উপমান
③ উপমিত
④ মধ্যপদলোপী

প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা বোঝালে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়। আর পরোক্ষ বস্তুটাকে বলা হয় উপমান।

[রক্ত লাল পতাকা — রক্ত: উপমেয় (প্রত্যক্ষ বস্তু); লাল: সাধারণ গুণ; পতাকা: উপমান (পরোক্ষ বস্তু)]

অদৃশ্যমান + দৃশ্যমান	তুলনা + বাস্তব = বাস্তব সম্পর্ক	অবাস্তব সম্পর্ক, অর্থ নাই	মধ্যের পদ লোপ পাবে
রূপক	উপমান (N+A)	উপমিত (N+N)	মধ্যপদলোপী
তুলনীয় সমাস			
অদৃশ্যমান + দৃশ্যমান পরানপাখি (অদৃশ্য (x) দৃশ্যমান (✓)) মন মাঝি (x ✓) বিদ্যাসাগর (x ✓) জ্ঞানসিন্ধু (x ✓) বিষাদসিন্ধু (x ✓)	কাজলকালো (N, Adj) রক্তলাল (N, Adj) মিশকালো (N, A) তুষারশুভ্র (N, A) কুসুমকোমল (N, Adj)	বাহুলতা (N, N) পুরুষসিংহ (N, N) অধরপল্লব (N, N) করপল্লব (N, N) চন্দ্রমুখ (N, N) চাঁদমুখ (N, N) ফুলকুমারী (N, N)	সিংহাসন হংসপাখি মোমবাতি স্মৃতিসৌধ জীবনবীমা চিকিৎসাশাস্ত্র ঘর জামাই চালকুমড়া জ্যোৎস্নারাত ধ্বনিতত্ত্ব
মধ্যে রূপ দিতে হবে ব্যাসবাক্য করার সময়। → মন (রূপ) মাঝি = মনমাঝি	মধ্যে ন্যায়/ মতো দিতে হবে ব্যাসবাক্যে। মিশির (ন্যায়) কালো = মিশকালো	ব্যাসবাক্যের শেষে ন্যায়/ মতো। → বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা	মধ্যের পদ লোপ পাবে ব্যাসবাক্যে। স্মৃতি (রক্ষার্থে) যে সৌধ ⇒ স্মৃতিসৌধ

Exercise

① ঘনশ্যাম → উপমান
মেঘ কালচে

② বকধার্মিক → উপমান

③ বিড়ালতপস্বী → উপমান

④ ইস্পাত কঠিন → উপমান

⑤ বজ্রকঠোর → উপমান

⑥ শশাব্যস্ত → উপমান
খরগোশ

⑦ নয়নকমল → উপমিত
চোখ পদ্ম

⑧ ক্রোধানল → রূপক
× ✓

⊞ কর্মধারয় সমাসের একটা অংশ সাধারণ কর্মধারয় সমাস
* দুটি বিশেষণ পদ যখন একজনকে বোঝাবে তখন সেটা সাধারণ কর্মধারয় সমাস।

* জজসাহেব → যিনি জজ তিনিই সাহেব
* কাঁচামিঠা → যা কাঁচা তাই মিঠা

কখনও কখনও ক্রিয়াপদের পারস্পরিকতা বোঝায়।

* আসা যাওয়া → আগে আসা পরে যাওয়া
* ধোয়ামোছা → আগে ধোয়া পরে মোছা

—— o ——

নোট : মিমি বিনতে সিদ্দিকী

01

সমাস দ্বিতীয় ক্লাস

হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাত স্যার
নোট → মিম্মি

বহুব্রীহি সমাস

◫ যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে নতুন কিছু বোঝায় বা অন্য পদকে বোঝায় বা নতুন অর্থ বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

উদাহরণ

⇒ বীণাপাণি = দেবী সরস্বতী (বীণা = বাদ্যযন্ত্র, পাণি = হাত এখানে, বাদ্যযন্ত্র বা হাতকে না বুঝিয়ে নতুন অর্থ বুঝিয়েছে তাই বহুব্রীহি সমাস)

⇒ দশানন = রাবণ (দশ = সংখ্যা, আনন = মাথা এখানে, পূর্বপদ বা পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে সম্পূর্ণ নতুন অর্থ 'রাবণ' বুঝিয়েছে)

⇒ বিশালাক্ষী = দেবী দুর্গা (বিশাল = বড়, অক্ষী = চোখ এখানে, বড় বা চোখ কোনটি না বুঝিয়ে সম্পূর্ণ নতুন অর্থ বুঝিয়েছে)

◫ উল্লেখ্য → বহুব্রীহি নিজেই বহুব্রীহি সমাস

⇒ বহুব্রীহি = বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার [এখানে বহু বা ধান কোনটির অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝানো হচ্ছে।]

প্রকারভেদ

বহুব্রীহি সমাস প্রধানত ৮ প্রকার।

① ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
② সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
③ ব্যতিহার বহুব্রীহি
④ সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
⑤ প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
⑥ মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
⑦ অলুক বহুব্রীহি
⑧ নঞ বহুব্রীহি

এই তিনটা অন্য সমাসের মধ্যেও পাওয়া যায়।

* নতুন বইয়ে ৮টা প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

⑥ মধ্যপদলোপী
↓
(i) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
(ii) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

⑦ অলুক → (i) অলুক দ্বন্দ্ব
(ii) অলুক তৎপুরুষ
(iii) অলুক বহুব্রীহি

⑧ নঞ → (i) নঞ তৎপুরুষ
(ii) নঞ বহুব্রীহি

02

বহুব্রীহি সমাসের প্রাথমিক কিছু নিয়ম

	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
① মাতৃক —থাকলে→ মাতা,	নদীমাতৃক	= নদী মাতা যার
② পত্নীক ——→ পত্নী,	বিপত্নীক	= বিগত পত্নী যার
③ জানী ——→ জায়া,	যুবজানী	= যৌবতী জায়া (স্ত্রী) যার
④ গন্ধি / গন্ধ → গন্ধ,	সুগন্ধি	= সুগন্ধ যার
⑤ নাভ ——→ নাভি;	পদ্মনাভ	= পদ্ম নাভিতে যার
**⑥ স ——→ সহ বা সহিত,	সজল	= জলের সহিত/ সহ বর্তমান
	সবান্ধব	= বান্ধব সহ বর্তমান
	সস্ত্রীক	= স্ত্রী সহ বর্তমান
⑦ সহ ——→ সমান,	সহকর্মী	= সমান কর্মী যার
	সহোদর	= সমান উদর (পেট) যার
⑧ অক্ষি / অক্ষ → অক্ষি,	কমলাক্ষ	= কমলের ন্যায় অক্ষি যার

অনেক সময় অক্ষি না থেকে অক্ষী (ী) থাকতে পারে। তখনও অক্ষি হবে মানে (ি) হবে।

হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাত স্যার
নোট : সিগ্মি বিনতে সিদ্দিকী

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ আলোচনা

1 ব্যতিহার বহুব্রীহি

⇒ দুটি বিশেষ্যের বা ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়।

উদাহরণ

⇒ কানাকানি

⇒ চুলাচুলি

[Exam এ সমস্তপদ দিয়ে বলতে পারে এটা কোন সমাস, অথবা নিচের কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহি অভাবেও আসতে পারে।]

মনে রাখার কৌশল

* পূর্বপদের শেষে "আ" এবং পরপদের শেষে "ই" থাকলে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়।

উদাহরণ

① কোলাকোলি (আ, ই)

② লাঠালাঠি (আ, ই)

③ চুলাচুলি (আ, ই)

④ কানাকানি (আ, ই)

* দ্বিরুক্ত শব্দের মতো যদি হয় তবে ব্যতিহার বহুব্রীহি হবে।

⇒ মারামারি

⇒ টানাটানি

সূত্রের ব্যতিক্রম

⇒ গোলাগুলি = গোলা ও গুলি

এখানে গোলা অর্থ গুলি আবার গুলি অর্থও গুলি

যেহেতু দুইটাই একই অর্থ বোঝাচ্ছে তাই এটি সমার্থক দ্বন্দ্ব

04

2 ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি

⇒ পূর্বপদ এবং পরপদ উভয়ই বিশেষ্য এবং নতুন অর্থ প্রধান তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। (বিশেষ্য (N) + বিশেষ্য (N) এবং নতুন অর্থ প্রধান)

উদাহরণ

⇒ বীণাপাণি (N)(N) = সরস্বতী

[বীণা = বাদ্যযন্ত্র, পাণি = হাত
এখানে পাণি বা হাত না বুঝিয়ে দেবী সরস্বতীকে বুঝিয়েছে। তাই ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি
N+N এবং নতুন অর্থ]

⇒ আশীবিষ (N)(N) = সাপ

[আশী = দাত, বিষ = প্রয়োজন
এখানে দুটি অর্থের একটিও না বুঝিয়ে সাপকে বোঝানো হয়েছে তাই ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি]

⇒ ঊর্ণনাভ (N)(N) = মাকড়সা

[ঊর্ণ = সুতার জাল, নাভ = নাভি
কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ নতুন অর্থ মাকড়সা বুঝিয়েছে তাই ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি]

⇒ পদ্মনাভ (N)(N) = বিষ্ণু

[পদ্ম = পদ্ম ফুল, নাভ = নাভি
এখানে বিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে]

⇒ ইত্যাদি = আরো বা প্রভৃতি

[ইত্যাদি ভাঙলে হয় ইতি (N) (শেষ) + আদি (N) (শুরু)
কিন্তু এখানে ভিন্ন অর্থ বা নতুন অর্থ দিয়েছে তাই ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি]

⇒ গোঁফখেজুরে (N)(N) = নিতান্ত অলস.

[যদি ব্যাসবাক্যে থাকে, গোঁফে খেজুর যার তখন ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। (নতুন বইয়ে)
গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খান না যিনি = মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি]

———— o ————

3 সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

⇒ পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য এবং নতুন অর্থ প্রধান অর্থাৎ (Adj + N এবং নতুন অর্থ প্রধান) হলে সমানাধিকরন বহুব্রীহি।

উদাহরণ

⇒ বিশালাক্ষী = দেবী দুর্গা
(A) (N)
[বিশাল = বড়, অক্ষী = চোখ
এখানে পূর্বপদ, পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে নতুন অর্থ দুর্গাকে বুঝিয়েছে]

⇒ সুহৃদ = বন্ধুকে বোঝায়
(A) (N)
[সু = সুন্দর, হৃদ = হৃদয়
এখানে নতুন অর্থ বন্ধুকে বোঝায়]

অনুরূপভাবে,

- অল্পবয়স্ক = অল্প বয়স যার (ব্যক্তিকে বোঝায়)
- সুশীল = সুন্দর আচরন যার (")
- সুশ্রী = সুন্দর চেহারা যার (")
- হতশ্রী = মন্দ চেহারা যার (")
- হতবুদ্ধি = মন্দ বুদ্ধি যার (")
- বহুব্রীহি = বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার

→ সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

4 সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

⇒ পূর্বপদে সংখ্যা এবং নতুন অর্থ প্রধান বোঝালে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

⇒ চৌচালা = ঘরকে বোঝায়।
[চৌ = ৪, চালা = চাল
কিন্তু এখানে নতুন অর্থ ঘরকে বুঝিয়েছে।]

⇒ দশানন = রাবন
[দশ = সংখ্যা, আনন = মাথা
এখানে রাবনকে বুঝিয়েছে]

⇒ পঞ্চানন = শিব
[পঞ্চ = ৫, আনন = মাথা
এখানে নতুন অর্থ শিব কে বুঝিয়েছে]

⇒ সেতার = বাদ্যযন্ত্র
[সে ফার্সি উপসর্গ এটা দিলে ৩ বোঝায়
তার = তার,
এখানে ৩ বা তার না বুঝিয়ে বাদ্যযন্ত্র বুঝিয়েছে।]

⇒ চতুর্ভুজ = নারায়ণ
৪ বাহু

[চতুর্ভুজ বলতে ৪ বা বাহু কোনটিকে না বুঝিয়ে নতুন অর্থ নারায়নকে বুঝিয়েছে তাই অসংখ্যাবাচক বহুব্রীহি]

⇒ দশভুজা = দেবী দুর্গা [দশ = সংখ্যা, ভুজা = বাহু কিন্তু এখানে দেবী দুর্গাকে বুঝিয়েছে।]

⇒ চৌকাঠ = দোরজার নিচের কাঠ [নতুন অর্থ বুঝিয়েছে]
৪ কাঠ

⇒ চৌবাচ্চা = পানি ধারণ করার পাত্র। [,,]
৪ বাচ্চা

দ্বিগু সমাস

১ম Point এ আলোচনা করা হয়েছে এখানে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি এর সাথে পার্থক্য বোঝার জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পূর্বপদে সংখ্যা এবং পরপদের অর্থ প্রধান হলে দ্বিগু

উদাহরণ

চৌরাস্তা = চার রাস্তার সমাহার, এখানে রাস্তাই বোঝাচ্ছে
৪ রাস্তা

শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার, এখানে বছরকেই বোঝাচ্ছে
১০০ বছর

ত্রিকাল = তিন কালের সমাহার, কালকেই বোঝাচ্ছে।
৩ কাল

⑤ অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না এবং নতুন অর্থ প্রধান হয় তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে।

উদাহরণ

⇒ মাথায় পাগড়ি = মাথায় পাগড়ি যার (বরকে বোঝায়)
⇒ কানে খাটো = কানে খাটো যে (বধিরকে বোঝায়)
⇒ হাতে বেড়ি = হাতে বেড়ি যার (আসামীকে বোঝায়)
⇒ পায়ে বেড়ি = পায়ে বেড়ি যার (পাগলা অর্থে)
⇒ গলায় গামছা = গলায় গামছা যার (দিনমজুর অর্থে)
⇒ কানে কলম = কানে কলম যার (কাঠমিস্ত্রী)
⇒ হাতে ছড়ি = হাতে ছড়ি যার (অন্ধ ব্যক্তি)

অলুক দ্বন্দ্ব

পূর্বপদ এবং পরপদে একই বিভক্তি এবং সমাসবদ্ধ হলেও বিদ্যমান থাকে তবে সেটা অলুক দ্বন্দ্ব।

⇒ দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে
⇒ পথে ও প্রান্তরে = পথে-প্রান্তরে
⇒ বনে ও জঙ্গলে = বনে-জঙ্গলে

অলুক তৎপুরুষ

পূর্বপদে বিভক্তি এবং পরপদের অর্থ প্রধান হলে অলুক তৎপুরুষ।

উদাহরণ

⇒ মনের মানুষ → মানুষ প্রধান
⇒ গরুর গাড়ি → গাড়ি প্রধান
⇒ সোনার বাংলা → বাংলা প্রধান

01.

হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাত স্যার
নোটঃ মিমি বিনতে সিদ্দিকী

সন্ধি বিচ্ছেদ

সন্ধি শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
⇒ সন্ধি শব্দটি তৎসম বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
⇒ সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।

সন্ধি শব্দের অর্থ কি?
⇒ মিলন, চুক্তি, ঐক্য ও সম্মিলন (পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলন)

সন্ধি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কি?
⇒ সন্ধি শব্দের সন্ধি- বিচ্ছেদ সম্+ধি ; ব্যঞ্জনসন্ধি

সন্ধির বিশ্লেষণ রূপ/ গঠন/ প্রকৃতি প্রত্যয় কি?
⇒ সম্ + √ধি + ই

সন্ধি শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত?
⇒ সন্ধি শব্দটি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

সন্ধি শব্দের বিপরীত অর্থ কি?
⇒ সন্ধি শব্দের বিপরীত অর্থ বিচ্ছেদ বা বিগ্রহ

সন্ধি কেন পড়ব?
⇒ উচ্চারণের সুবিধা দেয়।
যেমন: বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়। বিদ্যাআলয় বলার থেকে এদের মিলনে যে বিদ্যালয় গঠিত হয়েছে এটা উচ্চারণের সুবিধা দিয়েছে এবং মাধুর্যও আছে। "বিদ্যালয়" উচ্চারণের সহজ প্রবণতা দিয়েছে।

কোন পদের সন্ধি হয় না?
⇒ ক্রিয়াপদ/ অব্যয়পদের (অপশনে ক্রিয়াপদ না থাকলে অব্যয়পদ হবে)

সন্ধি বলতে কে বলে?
⇒ পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।
যেমন: বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয় [দুইটা "আ" মিলে একটা "আ" হয়েছে]
আ আ

সন্ধি কেন ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়?
⇒ সন্ধি উচ্চারণের সুবিধা দেয়। যেহেতু উচ্চারণ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়, তাই সন্ধি ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।

সন্ধির প্রকারভেদ

সন্ধি মূলত ৩ প্রকার—

① স্বরসন্ধি
② ব্যঞ্জনসন্ধি
③ বিসর্গসন্ধি

বাংলা শব্দের সন্ধি ২ প্রকার—

① স্বরসন্ধি
② ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎসম শব্দের সন্ধি ৩ প্রকার-

① স্বরসন্ধি
② ব্যঞ্জন সন্ধি
③ বিসর্গ সন্ধি

* বাংলা ভাষায় কোন সন্ধি পাওয়া যায় না? → বিসর্গ সন্ধি

৩ প্রকার সন্ধি কিভাবে চিনবো

① **স্বরসন্ধি:** প্রথম শব্দের শেষ বর্ণের উচ্চারণ এবং দ্বিতীয় শব্দের শুরুর অংশের উচ্চারণ যদি স্বরধ্বনির মতো হয় তবে সেটা স্বরসন্ধি। অর্থাৎ স্বর+স্বর

যেমন: ইত্যাদি = ইতি + আদি, শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা

(ইতি → ই, স্বর; আদি → আ, স্বর; শুভ → অ, স্বর; ইচ্ছা → ই, স্বর)

* (স্বরসন্ধি হতে গেলে দুই পাশের উচ্চারণই স্বরধ্বনি হতে হবে)

② **ব্যঞ্জনসন্ধি:** প্রথম শব্দের শেষ বর্ণের উচ্চারণ যদি ব্যঞ্জনের মতো এবং দ্বিতীয় শব্দের শুরুর অংশেরও যদি উচ্চারণ ব্যঞ্জনের মতো হয় তবে ব্যঞ্জনসন্ধি।

অর্থাৎ ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন

এরকম স্বর + ব্যঞ্জন

ব্যঞ্জন + স্বর হলেও ব্যঞ্জনসন্ধি হয়।

[ব্যঞ্জনসন্ধি হতে হলে একপাশে ব্যঞ্জন হলেই হবে]

যেমনঃ বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
ই ছ
স্বর ব্যঞ্জন

* স্বর কখনও ব্যঞ্জনবর্ণ ছাড়া উচ্চারিত হতে পারেনা। এই "কার" যখন ব্যঞ্জনবর্ণের আগে যুক্ত হয় তখন ব্যঞ্জনের উচ্চারণটা আগে হবে এবং স্বরটা পরে। এখানে, "ছেদ" এর ক্ষেত্রে আগে "ছ" এসেছে।

বিসর্গ সন্ধিঃ ১ম শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে এবং দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে স্বর বা ব্যঞ্জন।
অথবা বিসর্গ থাকলেই বিসর্গ সন্ধি হবে।

যেমনঃ পুরস্কার = পুরঃ + কার
ঃ

অন্তঃসন্ধি বহিঃসন্ধি

অন্তঃসন্ধিঃ দুইদিকে অনর্থক হলে অন্তঃসন্ধি। অর্থাৎ যে সন্ধি-বিচ্ছেদের পদ দুটি কোন অর্থ জ্ঞাপন করে না তাকে অন্তঃসন্ধি বলে। (অনর্থক + অনর্থক)

যেমনঃ দুগ্ধ = দুহ্ + ত [এখানে দুহ্ এবং "ত" শব্দের কোন অর্থ নেই]
নয়ন = নে + অন ["নে" এবং "অন" এর অর্থ নেই]

বহিঃসন্ধিঃ দুইদিকেই অর্থবোধক হলে বহিঃসন্ধি। অর্থাৎ দুটি অর্থ বিশিষ্ট পদের যে সন্ধি হয় তাকে বহিঃসন্ধি বলে। (অর্থক + অর্থক)

যেমনঃ শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা [শুভ এবং ইচ্ছা দুটির অর্থ আছে]
বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ সন্ধি দুই ধরনের —
(i) র্-জাত বা র্-শ্রেণির
(ii) স্-জাত বা স্-শ্রেণির

র্-জাতঃ র এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র্-জাত বিসর্গ বলে।
যেমনঃ অন্তর্ → অন্তঃ
অনেক শব্দের ক্ষেত্রে অন্তর কে অন্তঃ লেখা যায়। অর্থ পরিবর্তন হয়না। অর্থাৎ "র্" এর স্থানে (ঃ) আবার (ঃ) এর স্থানে "র্" লিখতে পারছি।

স্-জাতঃ স্ এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে স্-জাত বিসর্গ বলে।
যেমনঃ তপস্ → তপঃ
সুতরাং বিসর্গ (ঃ) মানে যেটা 'স' মানেও সেটাই।

* র শ্রেনির মধ্যে আছে → র, (ʳ)
* স শ্রেনির মধ্যে আছে → স, শ, ষ

} এগুলোকে (ঃ) দিয়ে replace করা যায়

নিয়ম যদি কোন সন্ধিজাত শব্দে (শ, ষ, স) যুক্ত অবস্থায় থাকে। এবং র, (ʳ), (ʳ থাকে তবে সন্ধি বিচ্ছেদে এদের স্থলে (ঃ) হবে।

শব্দের আগে শ যুক্ত থাকলে -

নিশ্চিত = নিঃ + চিত [শ এর জায়গায় (ঃ) হয়েছে]
দুশ্চিন্তা = দুঃ + চিন্তা
শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ
নিশ্চিহ্ন = নিঃ + চিহ্ন
দুশ্চরিত্র = দুঃ + চরিত্র
নিশ্চিন্ত = নিঃ + চিন্ত

শব্দের সাথে "ষ" যুক্ত থাকলে —

আবিষ্কার = আবিঃ + কার ["ষ" এর জায়গায় (ঃ) হয়েছে]

দুষ্কর = দুঃ + কর

দুষ্প্রাপ্য = দুঃ + প্রাপ্য

বহিষ্কার = বহিঃ + কার

বহিষ্কৃত = বহিঃ + কৃত

অনুষ্ঠান = অনুঃ + ঠান

চতুষ্পদ = চতুঃ + পদ

চতুষ্কর = চতুঃ + কর

ধনুষ্টংকার = ধনুঃ + টংকার

[আগের বইগুলোতে ধনুষ্টংকার বানানে ধনুষ্টঙ্কার আছে অনেকক্ষেত্রে ধনুঃ + টঙ্কার]

শব্দের সাথে "স" যুক্ত থাকলে;

মনস্তাপ = মনঃ + তাপ [স এর স্থানে (ঃ) বসেছে]

মনস্কামনা = মনঃ + কামনা

তিরস্কার = তিরঃ + কার

নমস্কার = নমঃ + কার

পুরস্কার = পুরঃ + কার

শব্দের মধ্যে 'র' থাকলে —

নিরালয় = নিঃ + আলয় [র এর পরিবর্তে (ঃ) বসেছে]

নিরাকার = নিঃ + আকার

নিরাবরণ = নিঃ + আবরণ

নিরাশ্রয় = নিঃ + আশ্রয়

নিরামিষ = নিঃ + আমিষ

নিরাময় = নিঃ + আময়

অন্তরীপ = অন্তঃ + ঈপ [ী কার আছে তাই ঈ দিয়েছি]

অহরহ = অহঃ অহ [শুধু হ দিয়ে অর্থ প্রকাশ পাচ্ছেনা তাই আগে "অ" দিয়েছি]

এরকম,

চতুরঙ্গ = চতুঃ + অঙ্গ

অন্তরঙ্গ = অন্তঃ + অঙ্গ

দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা

⊞ (র্) থাকলে —

দুর্নাম = দুঃ + নাম [(র্)এর পরিবর্তে (ঃ) হয়েছে]

আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ

নির্জন = নিঃ + জন

নির্ঘুম = নিঃ + ঘুম

দুর্নীতি = দুঃ + নীতি

অন্তর্বর্তী = অন্তঃ + বর্তী

দুর্বার = দুঃ + বার

⊞ "ো" কার থাকলে —

মনোরম = মনঃ + রম ["ো" এর পরিবর্তে (ঃ) দিয়েছি]

মনোযোগ = মনঃ + যোগ

সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত

তিরোধান = তিরঃ + ধান

তপোবন = তপঃ + বন {তপের নিমিত্তে বন চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস}

তিরোধান = তিরঃ + ধান (ো এর নিয়ম)

তিঃ + ওধান (র এর নিয়ম) × [তিরোধান অর্থ অদৃশ্য]

কিন্তু এখানে তিঃ এবং ওধান এর কোন অর্থ নেই তাই "র" এর নিয়ম হবে না।

এরকম, শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ

× শিঃ + ছেদ (র এর নিয়ম) এটা হবেনা অর্থহীন

মনোযোগ = মনঃ + যোগ ('Y' কার এর নিয়ম)

কিন্তু যদি 'য়' এটা ধরি তবে মনোযোগ = মনোয়ঃ + অগ ✗
অর্থহীন

এটা গ্রহনযোগ্য নয়।

এই ৬টা মনে রাখার টেকনিক "স্বশীষে ওরা বিসর্গ

নোটঃ এই নিয়মে বাদ যাবে নিপাতনে সিদ্ধ ও বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধির উদাহরণগুলো।

যেমনঃ পরিষ্কার = পরি + কার (বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি)

পরস্পর = পর + পর (নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি)

ব্যতিক্রম {এগুলো বানান শুদ্ধীকরণেও আসে}

নীরব = নিঃ + রব

নীরস = নিঃ + রস

নীরন্ধ্র = নিঃ + রন্ধ্র (ছিদ্র)

নীরোগ = নিঃ + রোগ

নীরক্ত = নিঃ + রক্ত

চক্ষুরোগ = চক্ষুঃ + রোগ

[মূলশব্দ ভাঙলে ই / উ, এবং জোড়াদিলে ঈ / ঊ]

স্বরসন্ধি (বানানের নিয়ম সহ)

নিয়ম-1ঃ আ = অ/আ + অ/আ

যদি সন্ধিবদ্ধ শব্দে "আ" থাকে তবে শব্দটি ভাঙলে দেখা যায় ২য় শব্দের শেষ অংশে "অ" অথবা "আ" আছে। এবং দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে "অ" অথবা "আ" আছে।

যেমন,

বিদ্যালয় = বিদ্য (×) / বিদ্যা + অলয় (×) / আলয়
আ অ আ অ আ

বিদ্যা অর্থ জ্ঞান শিক্ষা
আলয় অর্থ স্থান
} বিদ্যালয় বলতে এরকমটাই বোঝায়।

মূল শব্দের সাথে যেটির সংশ্লিষ্টতা আছে, সেটিই গ্রহন করব।

এরকম;

⇒ নবান্ন = নব + অন্ন
আ অ অ

⇒ নরাধিম = নর + অধিম
আ অ অ

⇒ রত্নাকর = রত্ন + আকর (ধ্বনি)
আ অ আ
অর্থ সমুদ্র

⇒ দ্বৈপায়ন = দ্বীপ + আয়ন
ঐ ঈ

ই/ঈ থাকলে আদিস্বরের ক্ষেত্রে ঐ হয়।
দ্বৈপায়ন Actually প্রত্যয়, আয়ন প্রত্যয় যখন কোন শব্দের সাথে যুক্ত হয় তখন আদিস্বর বৃদ্ধি পায়।

→ আরো কিছু উদাহরণ,

→ নরাবতার = নর + আবতার
→ সিংহাসন = সিংহ + আসন
→ একাংশ = এক + অংশ
→ একাধিক = এক + অধিক
→ হিমালয় = হিম + আলয়
→ হিমাচল = হিম + অচল
→ কারাগার = কারা + আগার
→ পাঠাগার = পাঠ + আগার

নিয়ম ২ঃ সন্ধিজাত শব্দে "ঈ" থাকলে সেটি ভাঙলে ১ম অংশে ই/ঈ এবং দ্বিতীয় অংশেও ই/ঈ পাওয়া যাবে।

যেমনঃ পরীক্ষা = পরি (উপসর্গ) + ঈক্ষা

"ঈ" তখনই হবে যখন কোন শব্দে ঈক্ষা, ঈক্ষণ, ঈশ, ঈশ্বর, ঈপ্সা, এগুলো থাকবে বাকি সব ক্ষেত্রে "ই" হবে।

যেমনঃ অতীত (ঈ) = অতি (ই) + ইত (ই)

সতীশ (ঈশ) = সতী (ঈ) + ঈশ (ঈ)

অতীন্দ্র = অতী + ইন্দ্র

রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র

বারীন্দ্র = বারি + ইন্দ্র

শচীশ (ঈশ) = শচী (ঈ) + ঈশ (ঈ)

উচ্চারণ দিয়ে বের করতে হবে

অয় উচ্চারন হলে 'এ' হবে (অয় = এ)	আয় উচ্চারন হলে 'ঐ' হবে (আয় = ঐ)	অব উচ্চারন হলে 'ও' হয় (অব = ও)	আব উচ্চারন হলে 'ঔ' হয় (আব = ঔ)
নয়ন (অয়) = নে (এ) + অন (অনেক সময় প্রত্যয়ের জন্য আসে তখন হবে √নী + অন) শয়ন (অয়) = শে (এ) + অন চয়ন = চে + অন ↓ অর্থ সঞ্চার/নির্বাচন/সংকলন	নায়ক (আয়) = নৈ (ঐ) + অক গায়ক (আয়) = গৈ (ঐ) + অক	পবন (অব) = পো ('ো') + অন (পবন অর্থ বায়ু) লবন (অব) = লো (ও) + অন পবিত্র (অব) = পো (ও) + ইত্র গবেষণা (অব) = গো (ও) + এষণা গবাদি (অব) = গো (ও) + আদি	নাবিক (আব) = নৌ (ঔ) + ইক ভাবুক = ভৌ + উক পাবক = পৌ + অক ↓ আগুন

(03)

অর বা আর এর মতো উচ্চারণ হলে ঋ হয়

অর/ আর = ঋ

দেবর্ষি = দেব + ঋষি → যিনি দেব তিনিই ঋষি (সাধারণ কর্মধারয় সমাস)
অর ঋ

সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি → সাত ঋষির সমাহার (দ্বিগু সমাস, পুরাতন বই – দ্বিগু কর্মধারয় বর্তমান বই)
অর ঋ

মহর্ষি = মহা + ঋষি → মহান যে ঋষি (সাধারণ কর্মধারয় সমাস)
অর ঋ

রাজর্ষি = রাজা + ঋষি → যিনি রাজা তিনিই ঋষি (")
অর ঋ

উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ → উত্তম যে ঋণ (সাধারণ কর্মধারয় সমাস)
অর ঋ

অধমর্ণ = অধম + ঋণ → অধম যে ঋণ (সাধারণ কর্মধারয় সমাস)
অর ঋ

বন্যার্ত = বন্যা + ঋত
আর ঋ

শীতার্ত = শীত + ঋত
আর ঋ

ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
আর ঋ

পিপাসার্ত = পিপাসা + ঋত
আর ঋ

তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত
আর ঋ

অতিরিক্ত তথ্যঃ বন্যার্ত → বন্যা দ্বারা আর্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)

নিয়ম 4: য/ ্য = ি/ ী + __

যদি কোন শব্দে য বা ্য ফলা থাকে তবে তার পরিবর্তে ি/ী হয় + এরপর যা আছে তাই থাকবে। য ফলা এর সাথে কোন কার থাকলে সেটা বসবে, না থাকলে সেখানে "অ" বসবে।

যেমন:

ইত্যাদি = ইতি + আদি
প্রত্যেক = প্রতি + এক
প্রত্যূষ = প্রতি + উষ
প্রত্যুষ = প্রতি + উষ (পুরাতন বই অনুসারে)
ব্যাকরণ = বি + আকরণ

ব্যর্থ = বি + অর্থ
জাত্যভিমান = জাতি + অভিমান [য ফলা এর সাথে কোন কার না থাকায় অ দিয়েছি]

যখন বানানের জন্য পরীক্ষায় আসবে

✗	✓
ব্যার্থ	ব্যর্থ
= বি + আর্থ	বি + অর্থ
আর্থ বলে কোন শব্দ নাই তাই এটা গ্রহনযোগ্য নয়।	

✗	✓
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
জাতি + আভিমান	= জাতি + অভিমান
শব্দ নাই	

✗ ব্যাতীত = বি + আতীত → শব্দ নেই
ব্যতীত = বি + অতীত

✗ অত্যাধিক = অতি + আধিক → হবে না
অত্যধিক = অতি + অধিক

তরকম;
ব্যতিক্রম = বি + অতিক্রম
অব্যয় = অবি + অয়
অব্যবসায় = অবি + অবসায় / ✗ আবিসয়
আদ্যন্ত = আদি + অন্ত
✓ আদ্যক্ষর = আদি + অক্ষর [ই ফলা এর নিয়ম]
✓ আদ্যাক্ষর = আদ্য + অক্ষর [আকারের নিয়মে]
(আ) (অ) (অ)

নদ্যম্বু = নদী + অম্বু (পানি)

পর্যালোচনা = পরি + আলোচনা
পর্যায় = পরি + আয়
উপর্যুপরি = উপরি + উপরি
উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত

[রেফ 'র' হয়েছে এবং য এর জন্য 'য']

নিয়ম ৮ঃ ব-ফলা = ব/ব + —

ব-ফলা থাকলে ব/ব হয় + পরের অংশে যা আছে তাই।

যেমন: স্বাগত = সু + আগত
স্বল্প = সু + অল্প
পশ্বাচার = পশু + আচার

নিচের কোনটি শুদ্ধ ?

✓পশ্বধম (পশু + অধম)
পশ্বাধম (পশু + আধম)
শব্দ নাই এরকম

এরকম,
তন্বী = তনু + ঈ
বধ্বাগমন = বধূ + আগমন [বধু থেকে এসেছে বঁধু; বউ " " বধূ]

side effect

আবশ্যের নিয়মে গঠিত

স্বাধীন = স্বু + অধীন ✓ / স্বু + অধীন ✗ → এই নিয়মে স্বু + অধীন হয় সেটা হবে না।

স্বায়ত্ত = স্বু + আয়ত্ত ✗ / স্ব + আয়ত্ত ✓

স্ব = নিজ

স = সহ

স্বু = ভালো

স্বায়ত্তশাসন → বানানের জন্য আসতে পারে।

———— ০ ————

01

কারক

হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাত স্যার
নোট : সিম্মি

① কারক শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

⇒ কারক শব্দটি সংস্কৃত বা তৎসম ভাষা থেকে এসেছে। কারক একটি পারিভাষিক শব্দ

② কারক কি সাধিত শব্দ?

⇒ কারক প্রত্যয় সাধিত শব্দ। কারককে প্রত্যয় করলে পাওয়া যায় (√কৃ + ণক)। এটি কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ।
(√কৃ = ধাতু, ণক = প্রত্যয়)

③ কারক বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

⇒ বর্তমান বই অনুসারে কারক বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। [কারক নির্ণয় করতে বাক্য লাগে সে দিক থেকে]

⇒ বাক্যের যেহেতু বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের কারক হয় সে দিক থেকে প্রথাগত বা পুরাতন ব্যাকরণ অনুসারে কারক শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

④ কারক শব্দটির অর্থ কি?

⇒ যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

⑤ কারক কাকে বলে?

⇒ বাক্যস্থিত নাম পদের সাথে ক্রিয়াপদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।

অথবা, বাক্যস্থিত বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে ক্রিয়াপদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।

যেমন : বাবা (বিশেষ্য) আমাকে (সর্বনাম) কলম (বিশেষ্য) কিনে দিলেন।

বাবা আমাকে কলম — নামপদ (কাজ বোঝায় না)
কিনে দিলেন — ক্রিয়াপদ (কাজ বোঝায়)

নামপদ ও ক্রিয়াপদের সম্পর্ক = কারক

02

কারকের প্রকারভেদ

পুরাতন প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে কারক ৬ প্রকার।

(I) কর্তৃ / কর্তা কারক
(II) কর্ম্ম কারক
(III) করণ কারক
(IV) সম্প্রদান কারক
(V) অপাদান কারক
(VI) অধিকরণ কারক

* বর্তমান নবম-দশম শ্রেনীর বইয়ে সম্প্রদান কারক উঠিয়ে এখানে সম্বন্ধ কারক দেওয়া হয়েছে।

∴ নতুন পুরাতন মিলিয়ে মোট ৭টি।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদান কারক ও দ্বিগু সমাসকে অস্বীকার করেছেন

কর্তৃ / কর্তা কারক

বাক্যে কাজটি যে বা যা করবে সেই হবে বাক্যের কর্তা।

* ক্রিয়াপদের কখনও কারক হয়না, কারক হয় নামপদের। আর নামপদটি কোন কারক হবে তা নির্ধারণ করে দেয় ক্রিয়াপদ।

সবগুলো কারক একসাথে

(I) আমি নৌকায় আছি। [অবস্থান করছি তাই অধিকরন কারক]
অধিকরন কারক

(II) আমি নৌকা থেকে নামলাম। [ঐ স্থানচ্যুত হয়ে গেছি তাই]
অপাদান কারক

(III) আমি নৌকায় পার হলাম। [নৌকার সাহায্যে পার হয়েছি]
করণ কারক — তাই করণ কারক

(IV) আমি নৌকা দেখছি। [আমি দেখার কাজ করছি নৌকাকে]
কর্ম্ম কারক — আশ্রয় করে তাই নৌকা কর্ম্ম কারক

(V) নৌকা চলে। [নৌকা নিজেই কর্তা]
কর্তৃ কারক

(VI) নৌকাওয়ালা ভাই কাজটি করেছে। [নৌকাওয়ালা করেনি ভাইটি করেছে নৌকাওয়ালা সম্বন্ধ]
সম্বন্ধ কারক — কারক। নৌকাওয়ালা পদবী

০৪

কর্তৃ/কর্তা কারক বিস্তারিত

[প্রথমে ক্রিয়া বের করতে হবে এরপর দেখতে হবে কাজটা ঐ বাক্যের কোন পদটি করছে]

উদাহরণ ঃ

① বাবা আমাকে কলম কিনে দিলেন। [দেওয়ার কাজটি করেছে বাবা]
কর্তৃ কারক

② বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। [ধান খাওয়ার কাজটা বুলবুলি করেছে]
কর্তৃ কারক

③ পাগলে বিলা বলে; ছাগলে কিনা খায় [বলার কাজ করেছে পাগল; খাওয়ার কাজটা ছাগলে করেছে]
কর্তৃ কারক কর্তৃ কারক

④ মেয়েরা ফুল তুলে। [তুলার কাজটা মেয়েরা করেছে]
কর্তৃ কারক

⑤ দশে মিলে করি কাজ। [দশে মিলে বলতে দশজন মিলে বুঝিয়েছে]
কর্তৃ কারক

⑥ গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল। [না বোধক কে হ্যাঁ বোধক করে নিব। "মানে" এটা ক্রিয়া। গাঁয়ে বলতে গ্রামের লোকদের বুঝিয়েছে]
কর্তৃ কারক

⑦ টাকায় টাকা আনে। [আনার কাজটা টাকা করেছে]
কর্তৃ কারক

⑧ অন্ধজনে বদ্ধঘরে, দিবারাত্রী কষ্ট করে। [করার কাজটি করেছে অন্ধজন]
কর্তৃ কারক

⑨ গৃহহীন থাকে চিরদিন পরাধীন। [গৃহহীন শক্তি বোঝাচ্ছে যার গৃহ নাই। থাকার কাজটা করছে গৃহহীন]
কর্তৃ কারক

⑩ অর্থ অনর্থ ঘটায়।
কর্তৃ কারক

⑪ একা যে ছিল রাজা। [থাকার কাজটি রাজা করেছে]
কর্তৃ কারক

⑫ খাচার ভেতর অচীন পাখি কেমনে আসে যায়।
[আসে, যায় কাজটা করেছে অচীন পাখি]

04

এরকম,

⑬ বসন্তে কোকিল ডাকে। [যেহেতু ডাকার কাজটা কোকিল করছে] তাই কোকিল কর্তৃকারক
কর্তৃকারক

⑭ স্রোতে নৌকা টেনে নিয়ে গেল। [এ বাক্যে ক্রিয়াপদ টানা, আর নৌকা টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করছে স্রোত। ∴ স্রোত কর্তৃকারক]
কর্তৃ কারক

⑮ সুদর্শন উড়ে যায়। [উড়ার কাজটা করছে সুদর্শন (পাখা)]
কর্তৃ কারক

কর্তৃ / কর্তা কারকের প্রকারভেদ

কর্তা ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য অনুসারে 4 প্রকার।

(I) মুখ্য কর্তা
(II) প্রযোজক কর্তা
(III) প্রযোজ্য কর্তা
(IV) ব্যতিহার কর্তা

মুখ্যকর্তা: যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে অর্থাৎ 1টি কর্তা তাকে মুখ্যকর্তা বলে।

মেয়েরা ফুল তুলে। [মেয়েরাই কাজটি সম্পন্ন করছে অর্থাৎ কর্তা 1টিই তাই মেয়েরা মুখ্য কর্তা]
মুখ্য কর্তা

প্রযোজক কর্তা: কর্তা যখন অন্যকে কোন কাজে নিয়োজিত করে কাজ সম্পন্ন করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা: মূল কর্তা যাকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করায় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।

⇒ শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন।
প্রযোজক প্রযোজ্য

[এই বাক্যে শিক্ষক পড়াচ্ছেন এবং ছাত্র বুঝাচ্ছে অর্থাৎ শিক্ষক ছাত্রকে দিয়ে পড়ার কাজটি করিয়ে নিচ্ছেন। তাই এখানে শিক্ষক প্রযোজক কর্তা এবং ছাত্র প্রযোজ্য কর্তা

05

প্রযোজক কর্তা → মা, প্রযোজ্য কর্তা → শিশু

⇒ মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে।
[এখানে মা শিশুকে দিয়ে কাজটি করাচ্ছে। তাই মা প্রযোজক কর্তা এবং শিশু প্রযোজ্য কর্তা]

⇒ সাপুড়ে সাপখেলা দেখায়। [সাপুড়ে সাপকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে]
প্রযোজক কর্তা (সাপুড়ে), প্রযোজ্য কর্তা (সাপ)

⇒ রাখাল গরু চরায়। [রাখাল গরুকে দিয়ে চরিয়ে নিচ্ছে। রাখাল প্রযোজক কর্তা এবং গরু প্রযোজ্য কর্তা]

ব্যতিহার কর্তা: একই সময়ে দুটি কর্তা একই কাজ করবে। যেসব বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্র একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে।

উদাহরণ: রাজায়-রাজায় (ব্যতিহার কর্তা), লড়াই উলুখাগড়ার প্রানান্ত।
[লড়াই করার সময় ২ জন রাজা একই কাজ করছে। সুতরাং এই বাক্যে রাজায় রাজায় ব্যতিহার কর্তা]

⇒ বাঘে মহিষে (ব্যতিহার কর্তা) একঘাটে জল খায়।

⇒ পন্ডিতে পন্ডিতে (ব্যতিহার কর্তা) গবেষনা করছে।

[উলুখাগড়া এর অর্থ বারবার অর্থ গুরুত্বহীন ব্যক্তি
*প্রানান্ত
প্রান + অন্ত (শেষ)
অর্থ মৃত্যু]

বাচ্য অনুসারে কর্তা ৩ প্রকার

(i) কর্মবাচ্যের কর্তা
(ii) ভাববাচ্যের কর্তা
(iii) কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা

কর্মবাচ্যের কর্তা: যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয় তাকে কর্মবাচ্য বলে। আর কর্ম যখন কর্তার কাজ করে, তখন তাকে কর্মবাচ্যের কর্তা বলে।

যেমন: পুলিশ (কর্মবাচ্যের কর্তা) কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে।

*[এই বাক্যে "হয়েছে" ক্রিয়াপদ। হয়েছে কাজটা সম্পন্ন করেছে পুলিশ তাই বাক্যের কর্তা পুলিশ। যদি সোজাভাবে বলতো পুলিশ চোর ধরেছে সেক্ষেত্রে এটা প্রত্যক্ষ উক্তি। কিন্তু এই বাক্যে ঘুরিয়ে বলেছে পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে। পরোক্ষ উক্তি তাই এখানে পুলিশ হয়ে গেছে কর্মবাচ্যের কর্তা

06

⇒ নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীনা লিখিত হয়েছে। [লিখেছেন নজরুল। নজরুল কর্মবাচ্যের কর্তা]
(নজরুল: কর্মবাচ্যের কর্তা)

ভাববাচ্যের কর্তাঃ যে বাচ্যের কর্তাকে কোন পুরুষ (উত্তম পুরুষ, মধ্যমপুরুষ, নামপুরুষ) দ্বারাই পরিবর্তন করা যায় না, অথবা পরিবর্তন করলেও ক্রিয়া পরিবর্তিত হবে না তাকে ভাববাচ্যের কর্তা বলে।

যেমন -

আমার ভাত খাওয়া হয়েছে।
(আমার: ভাববাচ্যের কর্তা)

* [এখানে কাজটি আমি করেছি। "আমার" এর জায়গায় যদি কারো নাম অর্থাৎ নামপুরুষ (করিম) বা তোমার (মধ্যমপুরুষ) ব্যবহার করি তবে দেখা যাবে ক্রিয়াপদ (হয়েছে) এর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। সুতরাং এখানে "আমার" ভাববাচ্যের কর্তা।]

কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তাঃ বাক্যে ক্রিয়ার কর্তার উল্লেখ না থাকলে কর্ম যখন কর্তার ভূমিকা পালন করে তখন কর্মটাকে বলে কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা।

যেমনঃ বাঁশি বাজে।
(বাঁশি: কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা)

[এখানে যদি বাঁশি এর আগে মনে মনে কোন কর্তা নেই তবে দেখা যাবে " বাজে কোন কর্তার সাথেই set হচ্ছে না যেমনঃ ✗ আমি বাঁশি বাজে। সুতরাং বাঁশি এখানে (প্রদত্ত বাক্যে) কর্তার ভূমিকা পালন করছে। ∴ বাঁশি কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা।]

এরকম,

⇒ সাইরেন বাজে, ⇒ ট্রেন চলে, নৌকা চলে।
(সাইরেন: কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা; ট্রেন: কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা; নৌকা: কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা)

——— ০ ———

(01)

কর্ম্ম, সম্প্রদান ও নিমিত্তার্থ কারক

ক্রিয়া সম্পাদন করে

কর্ম্ম কারকঃ বাক্যের কর্তা যাকে আশ্রয় করে, তাকে কর্ম্ম কারক বলে।

যেমনঃ আমি ভাত খাচ্ছি [এখানে আমি ভাতটাকে কেন্দ্র করে খাচ্ছি তাই ভাত কর্ম্ম]
কর্তা কর্ম্ম ক্রিয়াপদ

এরকম, আমি বই পড়ি।
কর্তা কর্ম্ম ক্রিয়াপদ

সাধারনত বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে কী/কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্ম্মকারক।

কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে কারন "কাকে" দিয়ে প্রশ্ন করে কর্ম্ম কারকের সাথে সাথে সম্প্রদান, কর্তৃ, অপাদান কারকও পাওয়া যায়।

কর্তৃ = নিজে করা বোঝালে
কর্ম্ম = স্বার্থ বোঝালে (Give and take)
সম্প্রদান = নিঃ স্বার্থভাবে দেওয়া বোঝালে
অপাদান = ভয়ের উৎস বোঝালে

কিছু উদাহরন দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

(i) রহিমকে মেতে দাও। [আমি বলছি রহিমকে মেতে দিতে, রহিমকে আশ্রয় করে কাজটি করছি, তাই এখানে রহিম কর্ম্ম]
কর্ম্ম কারক

(ii) রহিমকে যেতে হবে। [রহিম নিজে যাবে তাই রহিম কর্তা]
কর্তৃ কারক

(iii) রহিমকে ভিক্ষা দাও। [নিঃস্বার্থভাবে দিচ্ছি রহিমকে তাই সম্প্রদান]
সম্প্রদান কারক

(iv) রহিমকে ভয় পাই। [ভয়টা পাচ্ছি রহিমের কাছ থেকে, রহিম ভয়ের উৎস তাই রহিম অপাদান কারক]
অপাদান কারক

(v) রহিমকে বেতন দাও। [কর্ম্ম/সেবা দিয়েছে তাই টাকা দিতে বলেছে স্বার্থ আছে তাই কর্ম্ম কারক]
কর্ম্ম কারক

02

কর্ম কারক 2 প্রকার।

① গৌনকর্ম বা অপ্রধান কর্ম (যেটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক)

② মুখ্য কর্ম বা প্রধান কর্ম (যেটা বস্তুকেন্দ্রিক)

বাবা আমাকে কলম দিলেন।
কর্তা গৌন কর্ম মুখ্য কর্ম ক্রিয়াপদ

এই বাক্যে "দিলেন" ক্রিয়াপদ। আর দেওয়ার কাজটি বাবা করেছে তাই বাবা এখানে কর্তৃকারক। বাবা কলমকে আশ্রয় করে দিচ্ছে তাই "কলম" এখানে কর্ম। কাকে দিলেন? "আমাকে" আমাকে কর্ম।

"আমাকে" ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাই এটা গৌনকর্ম। "কলম" বস্তুকেন্দ্রিক বা প্রধান বা মুখ্য কর্ম।

[ক্রিয়াপদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগে]

Note → বাবা আমাকে কলম দিচ্ছে। এখানে বাবা শুধু আমাকেই দিচ্ছে নিঃস্বার্থ ভাবে দিচ্ছে না। নিঃস্বার্থভাবে দিলে অন্যকেও দিত। যেহেতু এটা Give and take তাই আমাকে সম্প্রদান না হয়ে কর্ম কারক হয়েছে।

সম্প্রদান কারক

যে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ সংগঠনকে নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া বোঝাবে সেই ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান / সংগঠন সম্প্রদান কারক হবে।

⇒ কাকে দিয়ে উত্তর পাওয়া যাবে কিন্তু সেই কাকেটা নিঃস্বার্থ হতে হবে।

যেমন: বোপাকে কাপড় দাও।
কর্ম কারক

এখানে, বোপাকে কাপড় দিচ্ছি আবার টাকার বিনিময়ে ফেরত নিব। এখানে স্বার্থ আছে। Give and take তাই এখানে বোপাকে কর্ম কারক।

03

⇒ সমিতিতে চাঁদা দাও।
সম্প্রদান

[স্বার্থ আছে। যদি 10 টাকা দেয় তবে 12 টাকা ফেরত পাবে যেহেতু give and take এক্ষেত্রে কর্মকারক (বর্তমান সময়ে) কিন্তু পূর্বে পূর্বে সমিতিতে স্বার্থ ত্যাগ করে চাঁদা দেওয়া হতো সেক্ষেত্রে সম্প্রদান কারক]

⇒ সৎ পাত্রে কন্যা দান।
সম্প্রদান কারক
[পাত্রের কাছে একবারে দায়িত্ব অর্পন করছে।]

⇒ মসজিদে অর্থ দাও।
সম্প্রদান কারক
[মসজিদে নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া বোঝাচ্ছে]

⇒ গুরুজনে কর নতি।
সম্প্রদান কারক
[গুরুজনকে সম্মান করছি, এটা ফেরত নেই না]

⇒ শিক্ষককে সম্মান কর।
সম্প্রদান কারক

এরকম;

- প্রিয়জন যাহা দিতে চায় তাই দিই দেবতারে।
  সম্প্রদান কারক
- জীবে দয়া কর।
  সম্প্রদান কারক
- গুরুদক্ষিণা দাও।
  সম্প্রদান কারক
- দরিদ্রকে ধন দাও।
  সম্প্রদান কারক
- তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে।
  সম্প্রদান কারক

04

নিমিত্তার্থ কারক (সম্প্রদান কারকের একটি)
আলোচনা

জন্য বোঝালে সাধারণত সেটি নিমিত্তার্থ কারক, না বোঝালে বা না থাকলে সম্প্রদান কারকই হবে।

① জলকে চল; বেলা যে পড়ে এলো।
নিমিত্তার্থ কারক

✳ [ঐ সময়ে কোন এক রাজার প্রজারা পুকুর থেকে জল আনতো। তারা একজন অন্যজনকে বলেছে বেলা শেষ হয়ে আসছে এজন্য তাড়াতাড়ি জল আনতে। অর্থাৎ জল আনার জন্য চল। যেহেতু "জন্য" বুঝিয়েছে তাই নিমিত্তার্থ কারক]

② দেশের সেবা করব। [দেশের জন্য সেবা করার কথা বলা হয়েছে।]
নিমিত্তার্থ কারক

③ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। [স্বাধীনতার জন্য বোঝাচ্ছে]
নিমিত্তার্থ কারক

④ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। [মুক্তির জন্যই তো সংগ্রাম]
নিমিত্তার্থ কারক

⑤ কবিতার জন্য মালা গেঁথেছি।
নিমিত্তার্থ কারক

⑥ সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু। [সুখের জন্য]
নিমিত্তার্থ কারক

⊞ option এ নিমিত্তার্থ না থাকলে সম্প্রদান হবে।

01

বানান শুদ্ধিকরণ

হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাত স্যার
নোট : মিম্মি বিনতে সিদ্দিকী

১নং নিয়ম

বিশেষণ + তা/য যোগ করলে বিশেষ্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটি শব্দ যদি বিশেষণ হয় তবে সেটাকে দুইভাবে বিশেষ্যে রূপান্তর করা যায়।

① 'তা' প্রত্যয় যুক্ত করে এবং
② 'য' প্রত্যয় যুক্ত করে

এখন কোন একটি শব্দ বিশেষণ কিনা তা বোঝার জন্য প্রথমে শব্দটি দিয়ে বাক্য তৈরী করব। এরপর "কেমন" বা "কি" দিয়ে প্রশ্ন করব। যদি "কেমন" দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় তবে সেটা "বিশেষণ" এবং "কি" দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া গেলে সেটা "বিশেষ্য"

উদাহরণঃ

লোকটি দরিদ্র (বিশেষণ) [লোকটি কেমন = দরিদ্র (বিশেষণ)]

⇒ দরিদ্র (বিশেষণ) + তা (প্রত্যয়) = দরিদ্রতা (বিশেষ্য)

* 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হলে আদিস্বরের কোন পরিবর্তন হয় না।
⇒ দরিদ্র + য = দারিদ্র্য

* 'য' প্রত্যয় যুক্ত হলে আদিস্বর বৃদ্ধি পায় বা পরিবর্তন হয়।

আদিস্বর বৃদ্ধির নিয়ম

অ থাকলে আ হয়
ই/ঈ থাকলে এ/ঐ হয়
উ/ঊ থাকলে ও/ঔ হয়
ঋ থাকলে অর/আর হয়

P.T.O

02

আদিস্বর যেভাবে বের করব

'দরিদ্র' শব্দটির প্রথম ব্যঞ্জন 'দ' এর সাথে কোন কার নেই। কার নেই মানে 'দ' এর সাথে 'অ' আছে। নিয়ম অনুসারে 'অ' থাকলে 'আ' হয়ে যাবে।

সুতরাং দরিদ্র + য = দারিদ্র্য

* 'য' টা 'য্' ফলা হয়ে যাবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

✗(i) দরিদ্র্য [এখানে 'য্' আছে কিন্তু আদিস্বর বৃদ্ধি করিনি তাই ভুল]

✗(ii) দারিদ্র [আদিস্বর বৃদ্ধি করেছি কিন্তু 'য্' ফলা দেইনি তাই ভুল]

✗(iii) দরিদ্র্যতা ['য্' ফলা এবং 'তা' প্রত্যয় একসাথে ব্যবহার করা যাবে না]

✗(iv) দারিদ্রতা [আদিস্বর বৃদ্ধি করেছি তাই 'তা' যুক্ত করলে ভুল হবে]

∴ সঠিক → দরিদ্র / দরিদ্রতা / দারিদ্র্য

বোঝার জন্য আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো

⇒ দীন + তা = দীনতা

⇒ দীন + য = দৈন্য ['ন' এর জন্য 'ন্য' ফলা হয়েছে]

'য' যোগ করার বেলায় আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে। 'দ' এর সাথে "ই" আছে। আদিস্বর এর নিয়ম অনুসারে ই/ঈ থাকলে এ/ঐ হয়।
∴ দীন + য = দৈন্য হয়েছে। দৈনতা হবে না, বাহুল্য দোষ হয়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

✗(i) স্বাতন্ত্র [আদিস্বর বৃদ্ধি করেছি কিন্তু "য্" দেইনি তাই ভুল]

✗(ii) স্বাতন্ত্র্য ["য্" দিয়েছি কিন্তু আদিস্বর বৃদ্ধি করিনি তাই ভুল]

✗(iii) স্বাতন্ত্রতা [আদিস্বর বৃদ্ধি করেছি আবার "তা" দিয়েছি তাই ভুল]

✗(iv) স্বাতন্ত্র্যতা ["তা" এবং "য্" ফলা একসাথে হয়না]

03.

∴ সঠিক : স্বতন্ত্র + তা = স্বতন্ত্রতা
স্বতন্ত্র + য = স্বাতন্ত্র্য

* আদিস্বর বৃদ্ধি করেছি এবং "য" এর জন্য "্য" ফলা হয়েছে।

সম + তা = সমতা
⇒ সম + য = সাম্য

বিচিত্র + তা = বিচিত্রতা
⇒ বিচিত্র + য = বৈচিত্র্য

বিশিষ্ট + তা = বিশিষ্টতা
⇒ বিশিষ্ট + য = বৈশিষ্ট্য

কৃপন + তা = কৃপনতা
⇒ কৃপন + য = কার্পন্য ["ঋ" কার থাকলে অর/ আর হয়]

সুজন + তা = সুজনতা [বাংলা ভাষায় এটার প্রয়োগ কম]
⇒ সুজন + য = সৌজন্য [উ/ ঊ কার থাকলে ও/ ঔ হয়ে যায়]

সুন্দর + তা = সুন্দরতা [এটা আমরা ব্যবহার করিনা]
সুন্দর + য = সৌন্দর্য ["র" এর সাথে "য" যোগ করলে "য" হয়ে যায় যুক্ত এবং "র" হয়ে যায় রেফ এবং উ/ ঊ থাকলে আদিস্বর বৃদ্ধির নিয়ম অনুসারে ও/ ঔ হয়ে যায়]

গম্ভীর + তা = গম্ভীরতা
⇒ গম্ভীর + য = গাম্ভীর্য

মধুর + তা = মধুরতা
⇒ মধুর + য = মাধুর্য

প্রচুর + তা = প্রচুরতা
⇒ প্রচুর + য = প্রাচুর্য

এক + তা = একতা
⇒ এক + য = ঐক্য

অলস + তা = অলসতা
⇒ অলস + য = আলস্য

বহুল + তা = বহুলতা
⇒ বহুল + য = বাহুল্য

উল্লেখ্য→ এই নিয়ম শুধু বানান শুদ্ধীকরণে support দিবেনা, এটার সাহায্যে→

বানান, প্রত্যয়, পদ, বাক্যশুদ্ধি ও নির্ণয় করা যাবে।

যেমন:

(i) প্রত্যয়→ দরিদ্রতা শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? দরিদ্র+তা অথবা বলতে পারে দারিদ্র্য শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?→ দরিদ্র+য

(ii) পদ নির্ণয়→ কোনটা কোন পদ এটা নির্ণয় করা যাবে। যেমন: সৌন্দর্য কোন পদ, সুন্দর কোন পদ এভাবে

(iii) বাক্যশুদ্ধি→ দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। বলতে পারে এখানে দৈন্যতা সঠিক নাকি ভুল

নিয়ম নং ২

অ-তৎসম শব্দে ণ/ ষ/ ঈ/ ী কার/ ঊ/ ূ কার/ ঋ/ ৃ কার এগুলো ব্যবহার করা যাবে না; ব্যবহার করতে হবে ন/ স/ ই/ ি কার/ উ/ ু কার ব্যবহার করতে হবে।

শব্দ পাঁচ প্রকার–

(i) তৎসম

অ-তৎসম শব্দ ←
- (ii) অর্ধ-তৎসম
- (iii) তদ্ভব যেটাকে বাংলা বলি
- (iv) দেশি
- (v) বিদেশি

মিম্মি

05

নিচের কোনটি সঠিক?

× (i) দুরবীন
× (ii) দূরবীণ
× (iii) দূরবিন

সঠিক উত্তর: দুরবিন।

কারণ "দুরবিন" ফারসি শব্দ মানে এটা বিদেশি শব্দ অর্থাৎ অ-তৎসম। আর অ-তৎসম শব্দে "ূ" কার "ী" কার এবং "ণ" বসেনা।

আরো কিছু উদাহরণ →

⇒ "কাহিনি" এটা হিন্দি শব্দ মানে বিদেশি অর্থাৎ অ-তৎসম শব্দ, তাই ই কার অর্থাৎ কাহিনী হবে না।

⇒ "বিরিয়ানি" এটা ফারসি শব্দ অর্থাৎ অ-তৎসম তাই "ি" কার হয়েছে অর্থাৎ বিরিয়ানী হবে না।

⇒ "চব্বিশপরগনা" ফারসি শব্দ মানে বিদেশি অর্থাৎ অ-তৎসম তাই "ণ" ব্যবহার করা যাবেনা।

শিহরন
কেরানি
ঝরনা / ঝর্না
চিরুনি
→ এগুলো বাংলা শব্দ তাই এখানে "ণ" ব্যবহার করা যাবেনা এবং "ি" কার হবে।

উল্লেখ্য → অধুনিক বাংলা বিধান অনুসারে কেরানি বাংলা শব্দ। তবে প্রথাগত ব্যকরন অনুসারে কেরানি পর্তুগিজ শব্দ

পরান → অর্ধ-তৎসম শব্দ অর্থাৎ অ-তৎসম তাই "ন" হবে।

দরুন → ফারসি শব্দ অর্থাৎ অ-তৎসম তাই ন হয়েছে।

কোরআন
কোরবানি
→ আরবি শব্দ. অর্থাৎ অ-তৎসম এজন্য ন এবং "ি" কার হয়েছে।

"ধূলি" তৎসম শব্দ তাই "ূ" কারই হবে।

৩ নং নিয়ম

যে সব শব্দের অর্থ আছে তাদের শেষে "স্থ" যুক্ত হয় এবং অর্থ না থাকলে "স্ত" হয়।
অর্থাৎ

অর্থক স্থ [স+থ]
অনর্থক স্ত [স+ত]

যেমন → ঠোঁটস্থ, ঠোঁট শব্দের যেহেতু অর্থ আছে তাই স্থ হয়েছে
এরকম মুখস্থ, তটস্থ
অসুস্থ, অসু অর্থ প্রাণ তাই স্থ হয়েছে।

নেশাগ্রস্ত → নেশাগ্র এটার কোন অর্থ নেই তাই স্ত বসেছে।
এরকম অভ্যস্ত, বিন্যস্ত ইত্যাদি।

নিচের কোনটি সঠিক?
✗ (i) অধীনস্থ
✗ (ii) অধীনস্ত

"স্থ" আমরা ব্যবহার করি ভেতরে বা অভ্যন্তরে অর্থে এখানে অধীন অর্থই ভেতরে বা আয়ত্তে থাকা তাই কিছুই যুক্ত হবে না।

ব্যতিক্রম → "বিধ্বস্ত" যদিও বিধ্ব শব্দের অর্থ আছে, তারপরও স্ত বসেছে।

৪ নং নিয়ম

উনিশ, উনত্রিশ, উনচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, উনষাট, উনসত্তর, উনআশি, উননব্বই এগুলো বাংলা শব্দ তাই "উ" দিয়ে লিখতে হবে। অন্যদিকে এগুলোর ক্রমবাচক রূপ "ঊ" দিয়ে লিখতে হবে। যেমনঃ ঊনবিংশ, ঊনত্রিংশ

নিচের কোনটি সঠিক?
✓ (i) উনিশ
✗ (ii) ঊনসত্তর
✗ (iii) উনবিংশ [তৎসম শব্দ আর তাই "ঊ" হবে]

07

৮ নং নিয়ম

অঞ্জলি, আবলি, আলি, ইক, কোন শব্দে এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত করলে "ি" কার হয়।

অঞ্জলি	আবলি	আলি	ইক
জলাঞ্জলি	কার্যাবলি	সোনালি	দিন + ইক = দৈনিক
শ্রদ্ধাঞ্জলি	রচনাবলি	রুপালি	ব্যবহার + ইক = ব্যাবহারিক
প্রেমাঞ্জলি	বিষয়াবলি	মিতালি	ভূগোল + ইক = ভৌগোলিক
গীতাঞ্জলি	নিয়মাবলি	বর্ণালি	
পুষ্পাঞ্জলি	শর্তাবলি	খেয়ালি	

* রুপালী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক এগুলো নাম, proper noun এর ক্ষেত্রে তাই সঠিক।

অতিরিক্ত তথ্য →

(i) ইক প্রত্যয় যুক্ত হওয়া শব্দটি বিশেষণ হয়ে যাবে।
(ii) ইক প্রত্যয় যুক্ত হলে আদিস্বর বৃদ্ধি পায়।
(iii) ইক প্রত্যয় যুক্ত হলে "ি" কার হয়।

01

পদ

হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাতে স্যার
নোট : মিম্মি বিনতে সিদ্দিকী

পদের দুই রকম সংজ্ঞা আছে।

- বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে এক একটি পদ বলে।
- বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি কিংবা প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে পদ বলে।

উদাহরণ: চলন্ত = চল + অন্ত
(প্রত্যয় আছে)

[প্রত্যয় করা যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় এর নিয়মে ভাঙা যাচ্ছে]
সুতরাং এটি একটি পদ

পদ প্রধানত বা মূলত ২ প্রকার।

① সব্যয় পদ
② অব্যয় পদ

সব্যয় পদ: যে পদগুলোকে বচন, লিঙ্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যায় তাকে সব্যয় পদ বলে।

উদাহরণ: সুন্দর + য = সৌন্দর্য
[একে প্রত্যয় দিয়ে পরিবর্তন করতে পারছি]
তাই সৌন্দর্য সব্যয় পদ

সব্যয় পদ ৪ প্রকার।

① বিশেষ্য
② বিশেষণ
③ সর্বনাম
④ ক্রিয়া

সর্বনামকেও পরিবর্তন করা যায়। যেমন: তার → তারা সুতরাং এটি সব্যয়।
ক্রিয়াপদ যেমন: করছে, করছি, করছো, এখানে ছে, ছি, ছো এগুলো ক্রিয়াবিভক্তি। অর্থাৎ ক্রিয়াপদকে পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং এটি সব্যয়

অব্যয় পদ: যে পদগুলোকে বচন, লিঙ্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না তাকে অব্যয় পদ বলে।

উদাহরণ: এবং, আর, অতএব ইত্যাদি। এগুলোকে পরিবর্তন করা যায় না।

02

পদ মোট ৫ প্রকার।

1. বিশেষ্য
2. বিশেষণ
3. সর্বনাম
4. ক্রিয়া

] → পরিবর্তন করা যায়

5. অব্যয়] → পরিবর্তন করা যায় না

নবম-দশম শ্রেণির নতুন বই অনুসারে,

পদ মোট ৮ প্রকার।

1. বিশেষ্য
2. বিশেষণ
3. সর্বনাম
4. ক্রিয়া
5. ক্রিয়া বিশেষণ [বিশেষণের প্রকরণের মধ্যে আছে]
6. আবেগ
7. অনুসর্গ
8. যোজক

উল্লেখ্য, অব্যয় চার প্রকার → (i) সমুচ্চয়ী, (ii) অনুকার (iii) অনন্বয়ী এবং (iv) অনুসর্গ অব্যয়

* আবেগ মূলত অনন্বয়ী অব্যয়,
* অনুসর্গ মূলত অনুসর্গ অব্যয়
* যোজক মূলত সমুচ্চয়ী অব্যয়

নোট: মিমি

03

বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে।

বিশেষণ পদ দুই প্রকার।

(i) নাম বিশেষণ
(ii) ভাব বিশেষণ

1. **নাম বিশেষণ:** যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।

নাম বিশেষণ 2 ধরনের

(i) বিশেষ্যের বিশেষণ
(ii) সর্বনামের বিশেষণ

বিশেষ্যের বিশেষণ

রহিম (বিশেষ্য) চালাক (বিশেষণ)

[এখানে, রহিমের জন্য চালাক এসেছে। তাই চালাক, রহিমের (বিশেষ্যের) বিশেষণ
প্রশ্নে থাকতে পারে, চালাক কোন বিশেষণ? উত্তরঃ বিশেষ্যের বিশেষণ]

সুস্থ - সবল (বিশেষণ) দেহ (বিশেষ্য) সবাই চায়

[এখানে, দেহ পদটি বিশেষ্য যার অবস্থা প্রকাশ করছে সুস্থ-সবল। সুতরাং সুস্থ-সবল বিশেষণ। দেহ (বিশেষ্য পদটিকে) 'সুস্থ সবল' পদটি বিশেষায়িত করায়, সুস্থ-সবল বিশেষ্যের বিশেষণ
[option এ না থাকলে নাম বিশেষণ]]

উল্লেখ্য → {কী দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষ্য পাওয়া যায়
কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষণ পাওয়া যায়}

:04:

সর্বনামের বিশেষণ

তিনি (সর্বনাম) চালাক (বিশেষণ)

[বাক্যস্থিত তিনি পদটি সর্বনাম, যার অবস্থা প্রকাশ করছে চালাক। সুতরাং চালাক বিশেষণ। চালাক (বিশেষণটি) এসেছে তিনি (সর্বনাম) এর জন্য। সুতরাং চালাক সর্বনামের বিশেষণ]

2 ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষায়িত করে তাকে ভাব বিশেষণ বলে।

ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার।

(i) বিশেষণের বিশেষণ
(ii) ক্রিয়া বিশেষণ
(iii) অব্যয়ের বিশেষণ
(iv) বাক্যের বিশেষণ

- যে বিশেষণটা বিশেষণের জন্য আসবে সেটা বিশেষণের বিশেষণ।
- যে বিশেষণটা ক্রিয়ার জন্য আসবে সেটা ক্রিয়া বিশেষণ।
- যে বিশেষণটা অব্যয়ের জন্য আসবে সেটা অব্যয়ের বিশেষণ
- যে বিশেষণটা বাক্যের জন্য আসবে সেটা বাক্যের বিশেষণ

বিশেষণের বিশেষণ

রহিম (বিশেষ্য) অতি (বিশেষণ) চালাক (বিশেষণ)

[কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষণ পাওয়া যায়]

রহিম কেমন? → চালাক (বিশেষণ)
কেমন চালাক? → অতি

[এই বাক্যে অতি এসেছে চালাক এর জন্য। অতি বিশেষণ, চালাক নিজেই একটি বিশেষণ। তাই 'অতি' বিশেষণের বিশেষণ]

05.

লোকটি অতিশয় দুঃখিত
বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষণ

লোকটি কেমন? → দুঃখিত (বিশেষণ)
দুঃখিত নিজে বিশেষণ, এটা বিশেষ্যের (লোকটির) বিশেষণ।
কেমন দুঃখিত? → অতিশয় (বিশেষণ)
সুতরাং অতিশয় বিশেষণের বিশেষণ।

মনে রাখার উপায়
(কে কার জন্য এসেছে)

ক্রিয়া বিশেষণ → যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমনঃ

(i) রকেট (দ্রুত) চলে (ক্রিয়া) — কিভাবে চলে → দ্রুত
(ii) আমি (ঢাকায়) থাকি (ক্রিয়া) — কোথায় থাকি → ঢাকায়
(iii) আমি (কালকে) পড়াবো (ক্রিয়া বিশেষণ, ক্রিয়া) — কখন পড়াবো → কালকে

ক্রিয়া বিশেষণ নির্ণয়ের সূত্র:
বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে কখন, কোথায়, কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই ক্রিয়া বিশেষণ

উদাহরণ: (ধীরে ধীরে) বায়ু বয় [বইছে কিভাবে → ধীরে ধীরে]
(পরে) এসো [কখন এসো → পরে]
ভদ্র লোকটি (ভেবে চিন্তে) কাজ করে। [কিভাবে করে → ভেবেচিন্তে]
আমরা (নির্ভয়ে) গুহায় ঢুকলাম [কিভাবে ঢুকলাম → নির্ভয়ে]
ছেলেটি (জোরে) চিৎকার করে উঠল। [কিভাবে চিৎকার করে উঠল → জোরে]
কাজটি (ভালোভাবে) সম্পন্ন করবে [কিভাবে সম্পন্ন করবে → ভালোভাবে]
প্রিয় (গুনগুনিয়ে) কথা বলে [কিভাবে কথা বলে → গুনগুনিয়ে]

* ক্রিয়া বিশেষণে এবং ভাবাধিকরণে সাধারণত ৭মী বিভক্তি হয়।

06.

বিশেষণের বিশেষণ 2 প্রকার

(i) নাম বিশেষণের বিশেষণ
(ii) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

[ক্রিয়া বিশেষণ বোঝার জন্য আগে আলোচনা করেছি]

নাম বিশেষণের বিশেষণ

রহিম (অতি) চালাক

[এ বাক্যে,
রহিম চালাক (বিশেষণ), চালাক বিশেষ্যের বিশেষণ এটাকে নাম বিশেষণও বলে।
বিশেষ্য

অতি = বিশেষণ
অতি আসছে চালাকের জন্য, চালাক যেহেতু নাম বিশেষণ তাই অতি হয়ে যাবে নাম বিশেষণের বিশেষণ]

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

রকেট (অতি) দ্রুত চলে

[এ বাক্যে চলে ক্রিয়াপদ। কিভাবে চলে? → দ্রুত (ক্রিয়া বিশেষণ) অতি আসছে দ্রুত কে Backup দেওয়ার জন্য। অতি নিজেও বিশেষণ। সুতরাং অতি ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ]

For practice

সে এ ব্যাপারে (অতিশয়) দুঃখিত → নাম বিশেষণের বিশেষণ
লোকটি দেখতে (সুন্দর) → বিশেষ্যের বিশেষণ
(একটু) পরে এসো → ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

———— o ————

ক্রিয়া বিশেষণের প্রকারভেদ

ক্রিয়া বিশেষণ 4 প্রকার –

(i) ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ
(ii) কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ
(iii) অবস্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ
(iv) নেতিবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

কিভাবে চিনবো কোনটা কোন বিশেষণ

(i) (কখন) দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পায় সেটা কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ।

(ii) যেমনঃ আমি কালকে পড়াবো। [কখন পড়াব → কালকে]
(কালবাচক)

(ii) (কোথায়) দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা অবস্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ।

যেমনঃ আমি ঢাকায় থাকি। [কোথায় থাকি → ঢাকায়]
(অবস্থানবাচক)

(iii) (কীভাবে) দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ।

যেমনঃ ধীরে ধীরে বায়ু বয়। [কিভাবে বয়? – ধীরে ধীরে]
ধরনবাচক

নেতিবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

না, নি, ন, নেই, নাই, নয় এই পদগুলো একা অবস্থায় থাকলে অব্যয়পদ। [না একটি কি? → অব্যয় পদ]
কিন্তু বাক্যে থাকলে ক্রিয়াপদ অথবা ক্রিয়াবিশেষণ হবে।
যেমনঃ বাবা বাড়িতে নেই। এখানে নেই কোন পদ?

* কোন বাক্যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াপদ না থাকলে (না, নি, ন, নেই, নাই, নয়) এই নেতিবাচক অব্যয়পদগুলো ক্রিয়াপদের ভূমিকা পালন করে।
∴ এই বাক্যে "নেই" ক্রিয়াপদ।

⇒ বাবা বাড়িতে থাকেনা। এখানে 'না' → নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ

এই বাক্যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াপদ আছে। 'না' এসেছে ক্রিয়াপদ এর জন্যই। এজন্য 'না' নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ।

এরকম;

⇒ ফুল কি ফুটেনি শাঁখে → নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ।

(০১)

ধ্বনি ও বর্ণ

নোটঃ মিশ্মি বিনতে সিদ্দিকী
ক্লাসঃ হাসনাত স্যার

⇒ ধ্বনি কি?

মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে বা মুখে যা উচ্চারণ করে তাই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ।

⊞ বাগ্‌যন্ত্র হলো ব্যঞ্জনসন্ধি। বাগ্‌যন্ত্র = বাক্ (কথা) + যন্ত্র (মেশিন)

অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্র হলো কথা বলার যন্ত্র। বাগ্‌যন্ত্রের অপর নাম বাক্-প্রত্যঙ্গ।

ফুসফুস থেকে শুরু করে নাক পর্যন্ত (ফুসফুস, শ্বাসনালি, খাদ্যনালী, স্বরযন্ত্র, মুখ-গহ্বর, নিচের চোয়াল, অধিজিহ্বা, জিভ, আলজিভ, কোমলতালু, শক্ততালু, মূর্ধা, দন্তমূল, দাঁত, ওষ্ঠ, নাসারন্ধ্র, নাসিকা গহ্বর, নাক) এই অঙ্গগুলো বাগ্‌যন্ত্রের উপাদান।

ধ্বনির উদাহরণঃ অ, আ, অ্যা, প্যা এগুলো প্রত্যেকটিই ধ্বনি কারণ এগুলো উচ্চারণ করতে পারছি।

⇒ বর্ণ কি?

ধ্বনির মধ্যে যেগুলো দেখা যায়, লেখা যায় এবং প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাদেরকে বর্ণ বলে।

অর্থাৎ ধ্বনির লিখিত রূপ, / নির্দেশক চিহ্ন / প্রতীক / সাংকেতিক চিহ্ন / দৃশ্য রূপকে বর্ণ বলে।

ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য

(i) ধ্বনি দেখা যায়না, বর্ণ দেখা যায়।

(ii) ধ্বনি বাংলা ভাষায় অনেক কিন্তু বর্ণ সীমিত। (বর্ণ মোট ৫০টি) অ, আ, অ্যা, প্যা এগুলো সব ধ্বনি। কিন্তু বর্ণ নয়। কারণ বাংলা বর্ণমালায় অ, আ পাওয়া গেলেও অ্যা, প্যা পাওয়া যায়না।

(iii) সকল বর্ণই ধ্বনি কিন্তু সকল ধ্বনিই বর্ণ নয়।

* বাংলা ভাষায় বর্ণমালা একটি। বর্ণমালায় বর্ণ মোট ৫০টি
এই ৫০টি বর্ণকে 2 ভাগে ভাগ করা যায়।
— (i) স্বরবর্ণ → স্বরবর্ণ ১১টি
(ii) ব্যঞ্জনবর্ণ → ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি

- ধ্বনি বাংলা ভাষায় মোট ৩৭টি
- স্বরধ্বনি ৭টি
- ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি
- ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০ কারন ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বাদ যাবে (ঞ, ণ, ষ, ং, ঁ, ঃ, ড়, য, য়) এই ৯টি।
- স্বরবর্ণ ১১টি কিন্তু স্বরধ্বনি ৭টি। স্বরবর্ণ থেকে বাদ যাবে (ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ) এই ৫টি, বাকি থাকে ৬টি সাথে অ্যা মোট ৭টি স্বরধ্বনি।

["অঙ্ক/অংক" এখানে প্রথম শব্দে "ঙ" এবং দ্বিতীয় শব্দে ং ব্যবহার করেছি। এখানে উচ্চারনগত কোন পার্থক্য নেই অর্থাৎ ধ্বনিগত পার্থক্য নেই। দেখতে বর্ণ দুটি আলাদা কিন্তু উচ্চারন একই। সুতরাং ধ্বনিগতভাবে একটিই।
জাম/যাম → বর্ণ 2টা আলাদা sound একই।
এভাবে বর্ণ কমতে কমতে ধ্বনি ৩৭টি হয়েছে।]

- ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা ৪১টি [প্রায়োগিক ধ্বনি]
অর্থাৎ ৩৭টার সাথে বাকি ৪টা। এই ৪টা অর্ধস্বরধ্বনি।
অর্ধস্বর গুলো হলো (ই̯, উ̯, এ̯, ও̯)

* যখন পূর্ণ উচ্চারন হয় তখন সেগুলোকে বলে স্বরধ্বনি। এবং যখন অর্ধ উচ্চারন হয় সেগুলোকে বলে অর্ধস্বরধ্বনি।
যেমন: চাই (আ+ই) → এখানে 'আ' পূর্ণস্বর। 'ই' টা অর্ধস্বর। কারন "ই" টা পূর্ণ উচ্চারন করিনা।
বলতে পারে "লাউ" শব্দে উ কোন স্বর → অর্ধস্বর
[দেখতে স্বর কিন্তু ব্যবহারে অর্ধস্বর]

অক্ষর নির্ণয়

জোয়ালের ভিত্তিতে স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ—

সম্মুখ স্বর	কেন্দ্রীয়/মধ্য স্বর	পশ্চাৎ স্বর	ঠোঁটের আকৃতি অনুসারে	জিহ্বার উচ্চতা অনুসারে
ই		উ	সংবৃত স্বরধ্বনি	উচ্চ স্বরধ্বনি
এ		ও	অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি	উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি
অ্যা		অ	অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি	নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি
	আ/হ		বিবৃত স্বরধ্বনি	নিম্ন স্বরধ্বনি

সম্মুখ স্বর ঃ উচ্চারণের সময় জিভ সামনের দিকে প্রসারিত হবে। অর্থাৎ উচ্চারণটা হবে সামনের দিকে। (ই, এ, অ্যা)

পশ্চাৎস্বর ঃ উচ্চারণের সময় জিভ পেছনদিকে সরে যায় অর্থাৎ উচ্চারণটা ঘুরে আসবে। (উ, ও, অ)

কেন্দ্রীয় স্বর ঃ জিভ সামনে পিছনে না গিয়ে মধ্যবর্তীতে অবস্থান করে। (আ)

ঠোঁটের আকৃতি অনুসারে

সংবৃত স্বরধ্বনি ঃ

উচ্চারণের সময় ঠোঁটদুটির মাঝের ফাঁকা সবচেয়ে কম থাকে। (ই, উ)

অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি ঃ উচ্চারণের সময় ঠোঁটদুটি সংবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় একটু বেশি ফাঁকা থাকে। (এ, ও)

অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি ঃ উচ্চারণের সময় ঠোঁটদুটি সংবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় বেশি কিন্তু বিবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় কম খোলা থাকে। (অ্যা, অ)

বিবৃত স্বরধ্বনি ঃ উচ্চারণের সময় ঠোঁটদুটি সবচেয়ে বেশি খোলা থাকে। (আ)

04

জিহ্বার উচ্চতা অনুসারে

উচ্চ-স্বরধ্বনিঃ জিভ সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকে। (ই, উ)

উচ্চ-মধ্যস্বরধ্বনিঃ জিভের অবস্থান উচ্চ ও নিম্নমধ্য স্বরধ্বনির মাঝামাঝি থাকে। (এ, ও)

নিম্নমধ্য স্বরধ্বনিঃ জিভের অবস্থান উচ্চমধ্য ও নিম্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণের মাঝামাঝি থাকে। (অ্যা, অ)

নিম্নস্বরধ্বনিঃ জিভ সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকে। (আ)

———— ০ ————